পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিএনপি-র ২৫ বছরের সাফল্য

'সকলের সাথে বন্ধুত্ব,কারও সাথে শত্রুতা নয়' এই নীতি নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর পরই বিভিন্ন ভাবে- বাংলাদেশের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি বিপন্ন হয়। সেই সময় আওয়ামী শাসনামলে পররাষ্ট্র নীতি হয়ে ওঠে একটি বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের আজ্ঞাবাহী- সেই অর্থে ঐ সময় আমাদের পররাষ্ট্রনীতি স্বকীয়তা অর্জন করে শক্ত ভীতে দাঁড়াতে পারেনি। আজ্ঞাবাহী পররাষ্ট্রনীতির কারণে স্বাধীনতার দু'বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে বহি:বিশ্বের উৎসাহ ও আগ্রহ তলানিতে এসে ঠেকে যায়। সেই সময়ে সেই বৃহৎ প্রতিবেশীর কতিপয় দুর্বল অনুসারী ছাড়া বাংলাদেশের কোন প্রকৃত বন্ধুরাষ্ট্র ছিল না। আরব বিশ্ব তো বটেই- এমন কি যে সব পশ্চিমা দেশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বন্ধুর মত পাশে এসেছিল তারাও বাংলাদেশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ কারণে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময়ে আন্তর্জাতিক মহল একাত্তরের মত আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসে নাই।

সময়ের প্রয়োজনে এদেশে রাজনীতিতে বিএনপি'র জন্ম। দেশের প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরীখেই বিএনপিকে পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারণ করতে হয়। তবে এই নীতি-নির্ধারণের গাইড লাইন একান্ত ভাবেই বিএন পির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তের পর-জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের আগেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি পর-নির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে স্বাধীন দেশের উপযোগী পর-প্রভাবমুক্ত ও গতিশীল পররাষ্ট্রনীতির তাগিদ অনুভব করেন। জিয়াউর রহমানের অভিজ্ঞতা ও অর্জন দুটি যোগ হয়েই রচিত হয়েছে বিএনপি'র ভবিষ্যৎ নীতিমালা।

১৯৭৭ সনে কলম্বো'তে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে পরিষ্কার হলো যে, বাংলাদেশের মত দেশেও পর প্রভাবমুক্ত ও গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি অস্তিত্ব রয়েছে। এই অস্তিত্ব জোরালোভাবে টের পাওয়া গেল তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে। তিনি সকল ধরনের আধিপত্যবাদ মোকাবেলায় জোট নিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দের সমর্থন চাইলেন। এই একই কণ্ঠে জিয়াউর রহমান পানি সমস্যা উপস্থাপিত করলেন জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে। বাংলাদেশ আবার আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচনার ইস্যু হলো। তিনি সকলের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কেউ তাঁকে বিমুখ করেনি। মুসলিম বিশ্ব, আরব বিশ্ব, পশ্চিমা বিশ্ব, তৎকালীন সোভিয়েত ব-কভুক্ত দেশসমূহ, আফ্রিকার দরিদ্রদেশ সর্বত্র তিনি বন্ধু খুঁজে পেলেন। এই সব বন্ধুত্ব বাংলাদেশকে এক ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করল।

বিএনপি রাজনৈতিক সরকার গঠনের পর জিয়াউর রহমানের গাইড লাইন কার্যকর করে ১৯৭৯-১৯৮২ পর্যন্ত সময়ে কতিপয় স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করে। জাপানের মত অর্থনৈতিক পরাশক্তিকে হারিয়ে ১৯৭৮ সনে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। মজার ব্যাপার ছিল, সোভিয়েত ব-কভুক্ত মঙ্গোলিয়া বাংলাদেশের সমর্থনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে। ও আই সি-তে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বাংলাদেশ অপরিহার্য হয়ে উঠে। ইরাক, ইরান যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টার সময় তিনি ছিলেন উভয় দেশের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য।

সত্যিকার অর্থে এ সময় থেকেই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কূটনীতির সূচনা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জেরদারের মাধ্যমে দেশগুলো ব্যাপক জনশক্তি রপ্তানি করা হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্যও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ভারসাম্যপূর্ণ নীতির কারণে বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সুবিধা অর্জনে সক্ষম হন।

বিএনপিই দেশবাদীকে একটি স্বাধীন জাতির উপযোগী পরদেশী প্রভা-বমুক্ত গতিশীল অথচ বাস্তবানুগ পররাষ্ট্রনীতি প্রদান করে এবং বারবারই বিএনপি-কে এই নীতি কার্যকর দায়িত্ব পালন করতে হয়।

১৯৯১ সনে দ্বিতীয় বারের মত বিএনপি ক্ষমতাসীন হয় এবং একটি পূর্ণ-মেয়াদ অতিক্রম করে। এই সময়ে প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্কের টানা-পোড়নে বিশেষ দক্ষতায় মোকাবেলা করা হয়। সার্ক-কে আরও কার্যকর করতে তৎপরতা চালানো হয়। এই সময়কালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। এই সম্মেলনে সার্ক দেশসমূহের বাণিজ্য সহযোগিতা সংক্রান্ত সাফটা চুক্তি গৃহীত হয়। বেগম খালেদা জিয়া সার্কভুক্ত দারিদ্র জনগণের জন্য ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করার জন্য এই সম্মেলনে আহ্বান জানান। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মহল বিশেষের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ফারাক্কা সমস্যা উপস্থাপন করেন।

বিএনপি সরকারের এই মেয়াদ কালে 'অর্থনৈতিক কূটনীতি' 'পররাষ্ট্রনীতির প্রধান নির্দেশনা হিসাবে গৃহিত হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালানো হয়। এই প্রথম বারের মত বৈদেশিক অনুদান নিরুৎসাহিত করা হয়। এই সব তৎপরতার কারণে বিশ্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক আলোকে 'উদয়মান ব্যাঘ্র' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে অধিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কার্যক্রম বাংলাদেশর ভূমিকা ও গুরুত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

২০০১ সনে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরমুখি পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে স্বাধীন ও একবিংশ শতকের উপযোগী পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ পূর্ববর্তী হাসিনা সরকার সময় উপযোগী পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে স্বাধীনতার পরবর্তী আওয়ামী সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতিই চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে সার্কের প্রতি হাসিনা সরকারের এক ধরনের ঔদাসিন্য লক্ষ্য করা যায়।

এই সাথে যোগ হয়েছে- নাইন/ইলিভ্যান উত্তর বিরূপ বিশ্ব পরিস্থিতি।

এই পৌনে দু'বছর সময়ে বাংলাদেশ সৃজনশীল নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড ও মায়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়। শীর্ষ পর্যায়ে সফর বিনিময়ের ফলে এসব দেশের সাথে সম্পর্ক ও সুযোগের নুতন মাত্রা যোগ হয়। বাংলাদেশ বাস্তব কারণেই আসিয়ান রিজিওন্যাল ফোরামের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছে। পূর্ব এশিয়ার সাথে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা (এশিয়ান হাই ওয়ের মাধ্যমে) গড়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে। এছাড়া সার্কসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে বাংলাদেশের ভূমিকা ও বেশ গঠনমূলক ও বাস্তবানুগ। চলমান 'অর্থনৈতিক কূটনীতি' ভবিষ্যতে সফল হবে। এটুকু আশা করাই যেতে পারে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দলীয় নেতৃবৃন্দ পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন

আগের পাতার পর

সাফল্যের ১৯৯১-৯৬ পর্ব

স্বাধীনতার পর পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে সমাবর্তন অনুষ্ঠান চালু।

১২। প্রতি বছর শিক্ষা খাতে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। গণশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক সম্প্রারণ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক

১৩। কৃষকদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ।

১৪। তাঁতী ও সমবায়ীদের ঋণের সুদ ও দন্ডসুদ মওকুফ।

১৫। কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ।

১৬। কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে কৃষি ঋণ বিতরণ এবং কৃষি ও সেচ কাজের সুবিধার্থে সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল, পাম্পসহ যাবতীয় কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাস ও কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা।

১৭। উন্মুক্ত জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল।

১৮। দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু। ১৯৮৯-৯০ সালের ১০০ ভাগ ঋণনির্ভর ৫ হাজার একশ' কোটি টাকার বাজেট থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ১২ হাজার ১শ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট যার ৪৩ ভাগ অর্থ নিজস্ব সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হয়েছে।

১৯। সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আড়াই মাইল দীর্ঘ যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু এবং দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এ ছাড়াও তিন শতাধিক ছোট বড় সেতু অসংখ্য কালভার্ট এবং কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও পাক-করা।

২০। বড়পুকুরিয়ার কয়লা এবং মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা উত্তোলন প্রকল্পের কাজ শুরু।

২১। ভোলা ও বাঙ্গোপসাগরে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র ও দিনাজপুরে কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কার।

২২। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রতি বছর দু'টি করে অনুসন্ধান কূপ খননের উদ্যোগ।

২৩। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন জটিলতা নিরসন করে অবসরগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পেনশন পাবার সুযোগ সৃষ্টি এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রী এবং প্রতিবন্ধী সন্তানদেরও আজীবন পেনশন পাবার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

২৪। সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৩ হাজার বাসস্থান নির্মাণ।

২৫। সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ২৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছরে উন্নীত করা।

২৬। মজুরি কমিশন গঠন করে শ্রমিকদের জন্য মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের বেতনের অনুদান ৮০ ভাগ বৃদ্ধি ও টাইম স্কেল প্রদান।

২৭। বিনা জামানতে ঋণ কর্মসূচি প্রদানের মাধ্যমে দেশে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপন হাঁস-মুরগি, মৎস্য ও গবাদিপশুর খামার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে লাখ লাখ বেকার যুবকের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি।

২৮। দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে টাকা যোগান দিয়ে দুঃস্থ মহিলাদের ঋণদান কর্মসূচি চালু।

২৯। নদী ভাঙনের পর ৩০ বছরের মধ্যে উক্ত জমি জেগে উঠলে তা জমির মালিককে ফেরত দেয়ার আইন।

৩০। বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশে ব্যাপক বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টের উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাপান, মালয়েশিয়া ও কোরিয়া সফর করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহবান।

৩১। দেশের বৃহৎ জেলায় ১০০ শয্যার হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায়, ৫০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। থানা স্বাস্থ্য কমপে-ক্সগুলোর শয্যা সংখ্যা ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত এবং অসংখ্য হাসপাতাল এম্বুলেন্স প্রদান।

৩২। এক বছরের কম বয়সী ৮৫ ভাগ শিশুকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আয়ত্তে আনা হয়। ৯০ ভাগ জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রাপ্তির সুযোগ করে দেয়া হয়।

৩৩। পাঁচ বছরে সারাদেশে তিন লাখ টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়েছে। পুরো কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দু'হাজার সালের মধ্যে ৮ লাখ নতুন টেলিফোন সংযোগ স্থাপিত হবে। দেশে কার্ডফোন সেলুলায় ফোন গ্রামীণ আইএসডি ফোন চালু হয়।

৩৪। বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি। ইতিমধ্যে ৩৩০টি থানায় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এর ফলে ১৫ হাজার গ্রামে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে।

৩৫। উপকূলীয় এলাকায় ১ হাজারের বেশি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ।

৩৬। সবুজ পাট থেকে মন্ড তৈরির ব্যবস্থা করে পাটের বহুমুখী ব্যবহার।

৩৭। আনসার-ভিডিপি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং আনসার-ভিডিপি সদস্যদের জন্য এ ব্যাংক থেকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা।

ধর্মীয়

৩৮। ঢাকায় স্থায়ী হাজী ক্যাম্প নির্মাণ।

৩৯। টঙ্গীতে বিশ্ব এজতেমার জন্য ৩০০ একরেরও বেশি জমি তবলিগ জামাতকে বরাদ্দ প্রদান।

৪০। মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় মাদ্রাসা ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা।

৪১। এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে বেসরকারি প্রাইমারী স্কুলের সমপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

৪২। মসজিদ, ঈদগা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কাজে ব্যাপকহারে আর্থিক অনুদান প্রদান।

অন্যান্য

৪৩। ১৯৯১ সালের সবচেয়ে প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সফলভাবে মোকাবিলা করা এবং বন্যা টর্নেডোসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে সঠিক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৪৪। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সর্বোচ্চ মৃত্যুদন্ড ও যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান করে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়ন।

৪৫। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গ্যালান্ট্রি এডওয়ার্ড প্রদান এবং রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ।

৪৬। দেশের জলসীমা পাহারা, নৌ ও সমুদ্রপথ জলদস্যুতা দমন ও চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠা।

৪৭। তিন বিঘা করিডোর ফিরিয়ে আনা।

৪৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শরণার্থী সমস্যার সমাধান।

৪৯। ফারাক্কা সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন এবং গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ভারতকে রাজী করানোর জন্যে আন্তর্জাতিক ফোরামের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ।

৫০। দেশ পরিচালনায় বিরোধীদলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিরোধীদলের সদস্যদের সমন্বয়ে ৬০টির মতো সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন।

৫১। একজন সরকার প্রধান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার কর্তৃক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলা একাডেমীর বইমেলা উদ্বোধন।

৫২। জাতীয় গ্রন্থ নীতি প্রণয়ন।

৫৩। ঢাকায় আন্তর্জাতিক বইমেলার সূচনা।

রজত জয়ন্তীর এই দিনে শহীদ জিয়া লও সালাম

বিএনপি'র ১৯ দফা

দেশের আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিম্নলিখিত ১৯ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন :

১। সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২। শাসনতন্ত্রের চারটি মূল নীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল-াহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলন করা।

৩। সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গঠন করা।

৪। প্রশাসনের সর্বস্তরে, উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভূখা না থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৭। দেশে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে সকলের জন্যে অন্ততঃ মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮। কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে, তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।

৯। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১০। সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

১১। সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুবসমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

১২। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।

১৩। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪। সরকারী চাকরিজীবীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১৫। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬। সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলির সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।

১৭। প্রশাসন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।

১৮। দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

১৯। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

প্রথম পাতার পর

উত্থান ও বিকাশের ২৫ বছর

কিন্তু অভ্যুত্থানের পর-পর খালেদ মোশাররফের আচরণে এবং আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের তৎপরতায় দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীর কাছে তিনি ভারতপন্থী আওয়ামী লীগের শাসন পুনপ্রবর্তনের প্রচেষ্টাকারী হিসেবে চিহ্নিত হোন। গোলযোগ শুরু হয় সেনাবাহিনীতে। বস্তুত ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে কোনো সরকারই ছিল না। মানুষ আবার আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। জাতির সেই ক্রান্তিকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দ্বিতীয়বার ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এলেন। প্রথমবার এসেছিলেন ১৯৭১ সালে, দিশেহারা মানুষের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পূর্বাপর সময়ে আমাদের সামরিক-বেসামরিক জীবনের ঘরে বাইরে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল, সে-সব ঘটনা সম্পর্কে ব্যাপক জনগোষ্ঠী বিস্তারিত জানার সুযোগ পায়নি। কিন্তু সমকালীন ঘটনাবলি ও বাস্তবতার ফসল ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার মিলিত প্রচেষ্টায় জিয়াউর রহমানের উত্থান ছিল স্বাগতিক। প্রাক-পটাত্তরের আদর্শ কায়েমে ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহ, সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক ক্যাডার ও বেসামরিক ক্যাডারদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সেনাবাহিনীর একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করে অপর অংশের দ্বারা ক্ষমতা দখল করতে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহেরের হটকারিতাপূর্ণ চেষ্টা এবং এই দুটো ধারারই বিরোধিতা করে বাকশালের পুনরুত্থান ও সেনাবাহিনী ধ্বংসের প্রয়াস রোধ করে জিয়ার উত্থান– এই তিনটি ঘটনাই ছিল নভেম্বরের আলোচিত ক'দিনের মূল প্রতিপ্রাদ্য এবং ইতিহাসেরও সত্য-সংলগ্ন বিজয়ী উপাদান। পরস্পর বিরোধী এই ত্রয়ী ঘটনায় খালেদ মোশাররফ কর্তৃক জিয়াউর রহমান বন্দী থাকার সময়ই খালেদ মোশার-রফ ও তার দুই সহযোগী নিহত হন এবং তাদের অনুসারীরা বিদ্রোহে ক্ষান্ত দেয়। জিয়া মুক্ত হয়ে এবং পরিস্থিতি উপলব্ধি করে কর্নেল তাহেরের অফিসার নিধনের হঠকারিতা দমন করেন। কর্নেল তাহের সেইসময় তার অনুগতদের লে. কর্নেলের ওপরে সব অফিসারকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে পরবর্তীকলে জানা যায়। কর্নেল তাহেরের উদ্দেশ্য ছিল, জিয়াউর রহমানকে দিয়ে তার রহস্যময় লক্ষ্য সাধনের হটকারিতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তবায়ন করা। কিন্তু শহীদ জিয়া সে ফাঁদে পা দেননি বরং সেই হটকারিতা দমন করে সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ও জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনেন। তাঁর সক্রিয় চেষ্টায় হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়। নভেম্বরের সেই কয়েকদিনের তিনমুখী ঘটনায় জনগণ এবং সেনাবাহিনী ত্রাতার ভূমিকায় জিয়াউর রহমানকে কামনা করেছিলেন খুবই সঙ্গত কারণে। সেনাবাহিনীর সমকালীন অবস্থায় জিয়াউর রহমানের চেয়ে বেশি পরিচিতি ও অত্যুজ্জ্বল অতীত অন্য কারো ছিল না। একাত্তরের ২৫ মার্চে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণায় দিশেহারা মানুষ উদ্দীপ্ত হয়েছিল। মানুষের হৃদয়ে তখন থেকেই গেঁথে গিয়েছিল এই নামটি। তাই রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্বের শূন্যতার কারণে জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটে পরিপূরক ভূমিকায়। মুজিব হত্যাকাণ্ড, চার নেতা হত্যাকাণ্ড, খালেদ মোশাররফ ও তার অনুসারীদের হত্যাকাণ্ড এবং সেনা অফিসার হত্যাকাণ্ড এ-সবের কোনোটিতেই তিনি জড়িত ছিলেন না বলে তার গ্রহণযোগ্যতাও ছিল বেশি। সংকট থেকে অতিক্রমের জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টায় জনগণ ও সেনাবাহিনী আন্তরিকভাবে সহায়তা করায় জাতির হাল ধরে সফলতা লাভ করেন শহীদ জিয়া। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পট-পরিবর্তনের পর থেকে জিয়াউর রহমানের উত্থানের ঘটনা পর্যন্ত সময়টি বিশে-ষণ করলে দেখা যাবে, জিয়াউর রহমানের ওপর দেশ পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছে মাত্র। ক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনি চিন্তা বা চেষ্টা কোনোটাই করেননি। সমকালে তাঁর বিকল্প ছিল না বলেই তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল সেই দায়িত্ব, জনগণ ও সেনাবাহিনীর তরফ থেকে।

জিয়াউর রহমান জাতির হাল ধরলেন ও সিপাহী-জনতার মহান বিপ-বের মাধ্যমে–জনগণ ও সেনাবাহিনীর অভিপ্রায় অনুযায়ী। কিন্তু দেশে তখন বিদ্যমান রয়েছে সামরিক শাসন যেটি জারি করেছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং যে সামরিক শাসনকে পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করলেন খালেদ মোশাররফ। খন্দকার মোশতাক আহমদ সামরিক শাসন জারি করলেও পার্লামেন্ট ভেঙে দেননি। খালেদ মোশাররফ পূর্ণমাত্রায় সামরিক শাসন বহাল করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদসহ অন্যান্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রেখে গেছেন। জিয়াউর রহমান সেই কাঠামোর মধ্যেই তাৎক্ষণিকভাবে দেশের হাল ধরলেন। কিন্তু সামরিক শাসন তো বাংলাদেশের নিয়তি হতে পারে না। বাংলাদেশের জনগণ সামরিক শাসনে শাসিত হওয়ার জন্য দেশ স্বাধীন করেনি। সেই সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা শহীদ জিয়াউর রহমানের ছিল বলেই তিনি দ্রুত দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেন। ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ ও শে-ষাত্মক বিষয় হচ্ছে এই যে, যে শেখ মুজিব তার দল আওয়ামী লীগের মাধ্যমে চিরকাল গণতন্ত্রের কথা বলে নিজে গণতন্ত্র হত্যা করে বাকশাল কায়েমসহ আরও বহু গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছিলেন, আর জিয়াউর রহমান দেশের হাল ধরার সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমে সামরিক অর্ডিনেন্স জারি করে শেখ মুজিব আরোপিত অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিল করেছিলেন এবং পরবর্তী জাতীয় সংসদে সংশোধনী এনে সেগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যাহোক জিয়াউর রহমান দ্রুত বেসামরিক শাসন প্রবর্তনের ধাপ হিসেবে প্রথমে জনগণের রায়ের জন্য ১৯৭৭ সালের মে মাসে হ্যাঁ-না ভোট বা রেফারেন্ডাম দেন, ১৯৭৮ সালের জুন মাসে উপহার দেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। হ্যাঁ-না ভোটে শহীদ জিয়া প্রবর্তিত ব্যবস্থাসমূহের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তার পক্ষে জনগণের বিপুল রায়-এর পর তিনি একটি জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতির সূচনা করেন। সেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলের ঐক্যমোর্চা গণতান্ত্রিক ঐক্য-এর প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এমএজি ওসমানী জিয়াউর রহমানের নিকট এক কোটি দশ লাখ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন।

দেশকে ধাপে ধাপে আবার বহুদলীয় গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত করার অভিপ্রায়ে জিয়াউর রহমনের অনুপ্রেরণায় প্রথমে গঠিত হয় 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' জাগদল। পরে আরও কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর এই ফ্রন্ট ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামে একক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে, ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২০০টি আসন লাভ করে বাংলাদেশে সৃষ্টি করে এক নতুন ইতিহাস এবং সূচনা করে নতুন ভবিষ্যতের। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে মধ্যমনি করে গড়ে ওঠা দল বিকশিত হতে শুরু করে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি রাজনৈতিক দলের বিপুল এই সাফল্যের পেছনে অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

১. বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়ার অত্যুজ্জ্বল অতীত, যোগ্য নেতৃত্ব, সততা ও স্বচ্ছতা।

২. বাংলাদেশের অনার্য অধ্যুষিত অন্তর্মুখী, সমন্বয়প্রিয় লড়াকু মানুষ এই দলের মধ্যে খুঁজে পায় তাদের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ। তাই বিভিন্ন দল, স্রোত ও মতের সমন্বয় ঘটে কিছু মৌলিক প্রশ্নে।

৩. আওয়ামী ল